Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 24-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তায় মানবাধিকার

লক্ষণ ঘোষ
ড. দেবযানী গুহ
অধ্যাপক দেবপ্রসাদ শিকদার
শিক্ষা-বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Human rights are rights inherent to all human beings irrespective of nationality, religion, language, sex, caste and class. Human beings are all equally entitled to these fundamental human rights without any discrimination. The great reformer and educator Pundit Iswar Chandra Vidyasagar had done a great job in protection of human rights. We know that Education is the manifestation of qualities already in Man. In that respect he had given stress on mass education for the true upliftment of human kind. He also tried to educate and uplift the backward people of society especially the tribal community. His works in Karmatar support this statement. Finally he had given his best efforts for the female education in Bengal. In this noble work, his childhood friend Pundit Madan Mohon Tarkalankar helped him very much. The women of Bengal were in precarious social position in the said times. They were tortured, deprived, ill-treated and exploited. Various social and religious prejudices had extremely narrowed their scope of life. In that situation, he fought against social prejudices like Polygamy, Koulianya Pratha in one hand and also advocated widow remarriage, on the other hand. Vidyasagar tried to educate the girls and females for the proper growth of Bengal. This paper is an attempt to analyse the educational ventures of Iswar Chandra Vidyasagar from the point of human rights.

Key words: Human Rights, Mass Education, polygamy, Widow Remarriage, Female Education.

ভূমিকা: মানবাধিকার বলতে বোঝায় যে কোন লিঙ্গ,বর্ণ,জাতি,ধর্ম বা স্থানের সকল মানুষের নিজস্ব অধিকার। মানবাধিকার তাই বৈষম্যহীন সমস্ত মানুষই এই অধিকারের যোগ্য পাওনাদার এবং কোনও ভাবেই তাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি ভোগ করতে পারে, তাই হল মানবাধিকার। অবশ্য সমস্ত মানুষই এই অধিকারের দাবিদার হলেও অনেকের ক্ষেত্রেই ভিন্ন অভিজ্ঞতার লক্ষ্য করা যায়। অনেক সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগ বা ব্যক্তি, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বা মানুষকে শোষণ করে।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন রূপে এই অধিকার গুলি ভোগ করে আসছে। আধুনিক পৃথিবীতে এই অধিকার অর্জনের একটি দীর্ঘ ধারা প্রবাহের সন্ধান মেলে ব্রিটেনে 1215-এর 'ম্যাগনাকাটা', 1679 হেবিয়াস করপাস আইন কিংবা 1689-এর বিল অব রাইটস তাঁর-ই সাক্ষ্য দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানবাধিকারের ওপর বারংবার আঘাত বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। তারই সূত্র ধরে আসে মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা। পরবর্তীতে জাতীপুঞ্জের চেষ্টায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্যোগে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার প্রয়াস আরও গুরুত্ব পায়।

এই অধিকার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, জীবন ও সভ্যতার সমস্ত দিগন্তেই এর উপস্থিতি। এর মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার মত নাগরিক অধিকার। 'আইনের চোখে সমতা'-র মত রাজনৈতিক অধিকার। আবার সমান কাজের জন্য সমান বেতন কিংবা সম্পত্তি অর্জনের মত অর্থনৈতিক অধিকার গুলিও মানবাধিকারের অঙ্গীভূত। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখার ও অনুশীলনের সাংস্কৃতিক অধিকার গুলিও মানব অধিকারের বৃহৎ আঙ্গিকের অঙ্গীভূত। সম্মতি ভিত্তিক বিবাহ প্রথা কিংবা শিক্ষার অধিকারের মত সামাজিক অধিকার গুলিও মানবাধিকারের ধারার সঙ্গে বিশেষভাবে সংপৃক্ত। বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে এই বিভিন্ন ধারার অধিকার গুলি রক্ষার জন্য নিরন্তর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তায় মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক কিভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তা আলোচিত হল।

প্রেক্ষাপট: এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। ঔপনিবেশিক পরি-কাঠামোয় বিদেশীদের দ্বারা অবদমিত, নিয়ন্ত্রিত ও নিপীড়িত ভারতীয় তথা বাঙালী জাতির ই প্রতিনিধি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, স্বভাবতই প্রতি-পদক্ষেপই তাকে বইতে হয়েছে পরাধীনতার গ্লানি। সেখানে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে চর্চা ও রক্ষার বিষয়টি আরও কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ ও সংশ্লিষ্ট নানা কাড়নে সমাজের অধিকাংশই ছিল দারিদ্র পীড়িত ও শিক্ষার আলোক বঞ্চিত। স্বভাবতই নানা সংস্কার-কুসংস্কারের মায়াজাল তাদের আবদ্ধ রেখেছিল। মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের না ছিল কোন অধিকার কিংবা কোন স্বাধীনতা। পুরুষদের বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথা ও বিধবাদের ওপর নানাবিধ নিপীড়ন ছিল স্বাভাবিক চিত্র। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির এক বৃহৎ অংশ ছিল শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত। শিক্ষার যে সংকীর্ণ সুযোগটুকু ছিল তাও সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চবিত্তদের মধ্যে। সাধারণের মধ্যে ছিল না কোন শিক্ষা তেমনি কোনও সচেতনতাও ছিল না, এই প্রেক্ষাপটেই বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা।

বিদ্যাসাগর তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বেন্থাম, মিল বা অগাষ্ট কোঁতের দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তবে তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পশ্চাতে দর্শনের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করাও কাম্য নয়। কার্যত এদেশীয় সমাজ, ধর্ম, নীতি কিংবা দর্শনের প্রভাবেই তাঁর চিন্তাধারার মূর্ত রূপ পেয়েছিল। মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্মের প্রেরণা ছিল। ভারতবর্ষীয় সমাজে চিরাচরিত রীতিনীতি, তাঁর পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক আবহ ইত্যাদি ও তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পিছনে সক্রিয় ছিল। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও উৎপীড়িত নারীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, সমানাধিকারের জন্য বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহ রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষা তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তাঁর নিরলস প্রয়াস অতুলনীয়।

তিনি নির্দিষ্টভাবে জোর দেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর, তার মতে একমাত্র শিক্ষাই পারে এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য:

১। মানবাধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ।
২। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কে বিশ্লেষণ।
৩। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা গঠন।
৪। নারীশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
৫। সর্বোপরি জনশিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন।

গবেষণার পদ্ধতি: এই গবেষণাপত্রটি মূলত: ঐতিহাসিক গবেষণামূলক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচনা করা হল।

শিক্ষাদর্শন : বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনঃ বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাতে এক নতুন মূল্যবোধের সূচনা ঘটায়। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে বিদ্যাসাগর মার্জিত বুদ্ধি ও সমাজ কল্যাণ-বোধ সমন্বিত এক নতুন শিক্ষা-দর্শ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং এইজন্যই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বা সমকালীন সমাজ সংস্কারকদের কৃতিত্বকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তিনি সবসময় মনুষ্যত্ব-বোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল রচিত 'Notes on the Sanskrit College' শিরোনামের প্রবন্ধে / রচনাতে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-দর্শের সমগ্র রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর এই শিক্ষা-চিন্তার গবেষণাগার ছিল সংস্কৃত কলেজ। এবং শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানস্পদ সংগ্রহ করে বাংলা শিক্ষার, বাংলাভাষার এবং বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদকে পাকাপোক্ত করে তোলা। অর্থাৎ তাঁর মতে শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বা শুধুমাত্র সংস্কৃত জানা পণ্ডিত কেউই সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য নয়। অর্থাৎ তিনি সর্বদা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবহার প্রচলনে সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যা পরবর্তীকালে আধুনিক শিক্ষা ব্যবহার 'মাইলস্টোন' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন–

(১) সেইসময় সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের ছেলেরাই পড়তে পারত। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই সকল শ্রেণীতে পড়ার অধিকারী ছিল এবং বৈদ্যরা কেবলমাত্র দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারত। বেদান্ত ও ধর্মশাস্ত্র পড়ার সুযোগ তারা পেত না। বিদ্যাসাগর সমগ্র হিন্দু জাতির জন্যই সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গোঁড়াপন্থিরা যুক্তি দেখালেন– "শূদ্রের সন্তানদের কখনও দেবভাষা শেখানো চলতে পারে না"। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, "তবে পণ্ডিতরা কিভাবে সাহেবদের সংস্কৃত শিক্ষা দেন?" বিদ্যাসাগরের অকাট্য যুক্তির কাছে তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের দরজা সমগ্র দরজা সমগ্র হিন্দু জাতির কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল।
(২) তাঁরই প্রচেষ্টাই প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণের কাজ শুরু হল।
(৩) সেইসময় কলকাতায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ত। যার ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই পড়বার বা পড়াবার খুবই অসুবিধা হত। তাই তিনি বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাস গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়ার জন্য তৎকালীন শিক্ষা-সংসদের কাছে আবেদন করলেন। শিক্ষা-সংসদ তাঁর আবেদনের গুরুত্ব অনুধাবন করে গ্রীষ্মাবকাশ মঞ্জুর করল, যা আজও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু আছে।
(৪) সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের কথা বলেছিলেন। কেননা তাঁর মতে, "যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন"। সেই সঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যারা কেবল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজী ভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত

শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনও ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না"।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষার আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ। নিজে সংস্কৃত পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা নীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী ছিলেন না। তাঁর শিক্ষানীতি ছিল দ্বিমুখী:

একদিকে প্রাচীন ব্যবস্থার সংস্কার; অপরদিকে নতুন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

শিক্ষালাভের পার্থিব উদ্দেশ্য বা ফললাভ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর সজাগ ছিলেন।

সে সময় হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের সরকারী উচ্চতম পথ বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেওয়া হত।

সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্ররাও যাতে একই মর্যাদা ও চাকরীর সুযোগ পায় তিনি তাঁর দাবি তোলেন এবং তা মঞ্জুরও হয়েছিল।

বিখ্যাত বিদ্যাসাগর গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন- "সংস্কৃত কলেজটিকে তাই বিদ্যাসাগর সেকালের টোল-চতুষ্পাঠী করতে চাননি। আবার তার সংলগ্ন হিন্দু কলেজের মত 'দেশী সাহেব' তৈরির কারখানাও করতে চাননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সত্যকারের মিলনতীর্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজকে। কেবল সংস্কৃত কলেজ নয়, সারা বাংলাদেশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ হোক, এই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা এবং সবচেয়ে রঙিন স্বপ্ন ছিল"। (পৃষ্ঠা- ১৮৯)।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার: বিদ্যাসাগর নারী জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বেথুন সাহেব যখন স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছিলেন কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজ তাঁকে বিভিন্নভাবে বাঁধা দিচ্ছিল, ঠিক তখনই বিদ্যাসাগর ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন কষ্টে নিমজ্জিত নারী সমাজের মুক্তির একমাত্র উপায় হল শিক্ষা। তাই বেথুন সাহেবের অনুরোধে স্কুল পরিচালনার জন্য অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই বালিকা বিদ্যালয়ের চালু হওয়ার প্রথম দিনেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ভর্তি করেছিলেন এবং নিজে কিছুদিন নিয়মিত পাঠদান করেছিলেন বিনা বেতনে ও তাদের জন্য বইও লিখেছিলেন। এই কারণে মদনমোহনকে গ্রামচ্যুত হতে হয়েছিল তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও পন্ডিতদের জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই কঠিন পরিস্থিতিতে ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েননি। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের নারীজাতির শিক্ষার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম তা কখনো ব্যর্থ হবে না এবং বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে ছায়া দান করবে।

বিদ্যাসাগর আদর্শবাদী হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব দূর-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ। কয়েকটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- যে সময় ছাত্রীদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। তাঁর পরামর্শে পালকি গাড়ির গায়ে 'মহানির্বাণতন্ত্রের' একটি শ্লোক- "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"- খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল। যার অর্থ- 'পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে"। তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে শাস্ত্রের দোহাই না দিলে এদেশের ধর্মভীরু মানুষকে কিছুই বুঝান যাবে না। যদিও তিনি জানতেন শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

স্কুল ইনস্পেক্টর থাকাকালীন বিদ্যাসাগর নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয়টি জেলায় বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল শিক্ষা সচেতনতার অভাব। প্রবাদ ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া করলে বা বিদ্যালয়ে গেলে অল্প বয়সে বিধবা হবে। যা সর্বৈব মিথ্যা। ঠিক এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও অশিক্ষার জন্যই সমাজে এক সময় চালু ছিল সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। স্ত্রীলোক হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই ছিল বিষময়, রামমোহন

রায় যুক্তি ও কঠোর সংগ্রাম দ্বারা ১৮২৯ খ্রীঃ নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রদ করেন ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায়। কিন্তু পরবর্তীতে বিধবাদের সংখ্যা বেড়ে যায়- কৌলীন্য প্রথার জন্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্যাসাগর খুব দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এই সব বাল্য বিধবাদের জন্য। শাস্ত্র-সিদ্ধান্তই একমাত্র এই কষ্ট ও চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারত গোটা নারী সমাজকে। তাই বিদ্যাসাগর সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র নিখুঁতভাবে পড়লেন এবং পরাশর সংহিতার একটি শ্লোককে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন-

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে"।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং-এর সহযোগিতার বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হল। স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায় বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালের 'সোম-প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে। পাঁচটি বিশেষ অন্তরায়-এর কথা উল্লেখ করা হয়।

১। এদেশের পুরুষরাই আজ পর্যন্ত ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেনি, সুতরাং তারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হবে কি করে ?
২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে মেয়েরা বেশিদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে না।
৩। অল্প বেতনের লোক দিয়ে শিক্ষার কাজ চালানো যায় না।
৪। ছেলেবেলায় স্কুলে যেটুকু লেখাপড়া শেখে, বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মেয়েরা তা ভুলে যায়। এদেশের জাতিভেদ প্রথার জন্য সাধারণত: উপযুক্ত পাত্রে মেয়েদের বিবাহ হয় না এবং সেইজন্য বিবাহের আগে তাদের যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, তা বৃথা হয়ে যায়।
৫। ইউরোপের মেয়েরা নিজেরা বিশেষ রান্নাবান্না করে না, হোটেলে খায়। সুতরাং তাদের লেখাপড়া করার অবসর আছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের যেহেতু গৃহকর্ম ও রান্নাবান্না করতে হয়, সেই কারণে তারা লেখাপড়ায় মন দেওয়ার সুযোগ পায় না।

এতসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নিজ অর্জিত অর্থ ব্যয় করে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। যদিও তিনি এই কাজে 'উডের ডেসপ্যাচ' অনুযায়ী সরকারী সহযোগিতা লাভ করেন।

বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৮৫৭ সালের ৩০-শে মে একটি চিঠিতে তিনি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে লিখেছেন-

"It is with great pleasure I have the honour to report that the inhabitants of Jowgong in Burdwan have at the suggestion of the Headmaster of the Model School at that Village established a female school there……
Having however visited it during this week, I have been led to hope that there is every chances of it flourishing within a short time. Not only do the inhabitants take the liveliest interest in its success, but the girls themselves appear to prosecute their studies with great delight and attention……".

স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি বড় অন্তরায় ছিল- এদেশীয় শিক্ষিকার অভাব। শিক্ষা অনুরাগী মিস. মেরী কার্পেন্টার এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য কলকাতায় আসেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর একটি বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মিস. কার্পেন্টার এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য বেথুন স্কুলে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন একটি পত্রে বিদ্যাসাগর তৎকালীন ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে-কে লিখলেন–

"....আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার জন্য মিস. কার্পেন্টার যে পথ অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্যে পরিণত করা কঠিন। ....এদেশের ভদ্র পরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধ প্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ এগারো বৎসরের বিবাহিত বালিকাদিগকেই গৃহের বাইরে যাইতে দেয় না, তখন তাহারা যে বয়স্কা মহিলাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিতে সম্মতি দিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকী থাকে অসহায়া, অনাথা, বিধবারা এবং তাহাদিগকেই এই কাজে পাওয়া যাইতে পারে। শিক্ষকতার কার্যে তাহারা কতদূর উপযুক্ত হইবে সে প্রশ্ন আপাততঃ বাদ দিয়াও আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে বিধবারা যদি অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কারে যোগ দেয় তাহা হইলে লোকচক্ষে তাহারা অবিশ্বাসের পাত্রী হইয়া উঠিবে, তাহা যদি হইয়া থাকে তবে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে"।

বিদ্যাসাগরের এই অভিমত ছিল অত্যন্ত বাস্তবোচিত ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। যদিও সরকার তাতে গুরুত্ব না দিয়ে 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সুফল না মেলায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তিনি তাঁর অন্তিমকাল পর্যন্ত নারীশিক্ষার অগ্রগতি ভীষণভাবে চাইতেন। তাই যদি কোনও মহিলা উচ্চশিক্ষিত হতেন তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পরীক্ষায় পাশ করলেন তখন বিদ্যাসাগর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসুকে সচিত্র সেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলীর একখন্ড উপহার সহ একটি অভিনন্দন পত্র পাঠান। তিনি এই গ্রন্থে স্ব-হস্তে লিখলেন—

> *"To Srimati Chandramukhi Basu, The First Bengali Lady who has obtained the Degree of Master of Arts of the Calcutta University from her sincere well-wisher Iswar Chandra Sarma".*

জনশিক্ষা: সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন বিদ্যাসাগর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করতেন। 'উডের ডেসপ্যাচ' তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে উৎসাহিত করেছিল। মাতৃভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের মহান ব্রত গ্রহণ করেই তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর- এই চারটি জেলায় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হলেন। কাজের সুবিধার জন্য চারজন সুশিক্ষিত, সাহিত্য অনুরাগী ও পরিশ্রমী ব্যক্তিকে চারটি জেলার সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেন। আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে জনগণ বুঝিয়ে বিদ্যালয় তৈরীর স্থান নির্বাচন করতে লাগলেন। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের যাবতীয় খরচ স্থানীয় অধিবাসীরাই বহন করেন কিন্তু বিনা বেতনেই ছাত্রবৃন্দ পড়াশুনা করার সুযোগ পেল। এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূর্ণ সফলতার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল উপযুক্ত শিক্ষকের। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল খুললেন। এই স্কুলের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীগণকে মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি দেওয়া হত। এইবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় ছিল- বাংলা সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য), ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব এবং ইংল্যান্ড ও গ্রীস রোমের ইতিহাস। কিন্তু মাতৃভাষায় শিশু ও কিশোরদের উপযোগী পুস্তক ছিল না। তাই পুস্তক রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। একাজে তিনি নিজে সর্বাগ্রে আত্মনিয়োগ করলেন। এছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত, পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁকে সহযোগিতা করলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের তিনখন্ডের 'চারুপাঠ'। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তিনভাগ 'শিশু শিক্ষা', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রচিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকরূপে বিবেচিত হল।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলে ও ইংরেজি শিক্ষাকে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। তিনি মনে করতেন ইংরেজি শিক্ষা- মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণকে সহযোগিতা করবে কখনো প্রতিকূল হবে না। তাই তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন যদিও এটিই পূর্বে মেট্রোপলিটন স্কুল ছিল।

গ্রন্থরচনা: কুসংস্কারযুক্ত ও অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু হয় হিন্দি বেতাল পঞ্চ-বিংশতি-র অনুবাদ দিয়ে। তিনি শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস রচনা করেন, যেগুলি ছিল যথাক্রমে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম, ভবভূতির উৎত্র রামচরিত সঙ্গে রামায়ণের উত্তরকান্ড এবং সেক্সপীয়ারের 'কমেডি অফ এবরস' নাটক অনুসরণে তিনি মার্শম্যান সাহেবের রচিত ইংরাজী গ্রন্থ- 'History of Bengal'-এর অনুসরণে লিখলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বিধবা বিবাহ'- যে শাস্ত্রসম্মত যে বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলবার জন্য তিনি লিখলেন- "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৫ খ্রী) যা তৎকালীন শিক্ষিত ও পন্ডিত সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। তিনি ব্যঙ্গাত্মকমূলক রচনাতেও ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। 'কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য' ছদ্মনামে লেখেন- 'অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজ বিলাস'। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি শ্লেষাত্মক বাক্যে পন্ডিতের মূর্খামি অ মূর্খের পান্ডিত্যকে তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন।

শিশুদের জন্য গ্রন্থ রচনা বিদ্যাসাগরের মহান ও অতুলনীয় কাজ যা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ১৯৫১ সালে তিনি সুকুমারমতি বালকবালিকাদের জন্য নানা ইংরেজি পুস্তক থেকে সঙ্কলন করে রচনা করলেন 'বোধোদয়'। সঠিকভাবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রচনা করলেন- 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'। ১৮৫৩ সালে তিনি রচনা করেন 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। ১৮৬৪ সালে বাংলা অভিধান 'শব্দ-মঞ্জরী' রচনা করেন।

এছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সমস্ত রচনার জন্য চিরদিনের প্রাতঃস্মরণীয় তা হল—

বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ, নীতি-বোধ, কথামালা, চরিতাবলী এবং আখ্যান-মঞ্জরী।

কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর: বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শেষের দিকের বেশ কয়েকবছর(১৭ বছর) সাঁওতালগণ অধ্যুষিত কর্ম্মাটাঁড়ে (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) কাটিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর (সাঁওতালগণ) উন্নয়ন ও সমান অধিকারের কথা চিন্তা করতেন। সহজ সরল সাঁওতালদের মূলস্রোতে কীভাবে আনা যায় তা নিয়ে তিনি অনেক ভাবতেন। নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও আর্থিকভাবে সাহায্যও করতেন। সেই সঙ্গে এদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত না করতে পারলে এরা আরও পিছিয়ে পড়বে তাই তাদের শিক্ষার অধিকারের জন্য তিনি নানা ভাবনা চিন্তা করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত / উপসংহার: মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর, তিনি তাঁর আদর্শ চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেছেন শিক্ষাদর্শনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখী। নিজে সংস্কৃত পন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানী হয়েও শিক্ষাকে তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর 'সেকুলার' চরিত্রের পরিচয় দেয়। সংস্কৃত কলেজে তাঁর কর্মকান্ড থেকে প্রকাশ পায়- শিক্ষার অধিকার সবার- কোনো একটি শ্রেণীর মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখা ঠিক নয়। আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন শিক্ষার প্রসার- তাঁর উদারতার পরিচয় দেয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য নিজের অর্থব্যয় করে বিদ্যালয় স্থাপন ও বিধবা বিবাহ চালু করা- সবই তাঁর মহানুভবতার পরিচয় দেয়। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণী সাঁওতালদের অধিকারের কথা ভেবেছিলেন যা আজ সংবিধান স্বীকৃত। সর্বোপরি তাঁর রচিত বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে- 'বর্ণ পরিচয়ে'র জন্য তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ঘোষ, বি (২০১১), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, কোলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান লিমিটেড।
২। শর্মা, বি (২০০৬),বিদ্যাসাগর রচনাবলী (১+২), কোলকাতা সাহিত্যম।
৩। মিত্র, ই (২০১৬) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, কোলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
৪। শাস্ত্রী, শি (২০১৬), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কোলকাতা মাইতি বুক হাউস।
৫। দাস, র (১৯৭১),বিদ্যাসাগর, কোলকাতা, অশোক প্রকাশন।
৬। দে, পি (২০১৬),বিদ্যাসাগর স্মৃতি, কোলকাতা, জয়শ্রী প্রেস।
৭। পত্রিকা - জিজ্ঞাসা (২০১৩-২০১৪), ৩য়- ৪র্থ সংখ্যা, কোলকাতা, রেনেশাঁ পাবলিশার্স।